# কুন্তকের কৌণিক দৃষ্টিকোণ

*অধ্যাপক শুভঙ্কর দাস*

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নব বারাকপুর প্রফুল্লচন্দ্র মহাবিদ্যালয়

Mobile No. 9836872964, Mail : subhankardas201718@gmail.com

## প্রস্তাবনা

*'সোনার তরী'-র 'বর্ষা যাপন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ শেষ হয়েও শেষ না হওয়ার যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তারই ফলিত এবং তাত্ত্বিক রূপ যেন কুন্তক ও তাঁর সৃজনধর্মিতা! তা না হলে যে যুদ্ধ ফুরিয়েছে অনেক আগেই এবং রসবাদ ও ধ্বনিবাদ ভূষিত হয়েছে জয়ের মালায়, সেই ধুলো-জমা রণাঙ্গনে কেন তিনি আবার বাজাবেন রণভেরী আর প্রায় নিরস্ত্র অবস্থায়? প্রবলতর প্রতিপক্ষের সঙ্গে একটিমাত্র শব্দালঙ্কারকে হাতিয়ার করে তাঁর এই অসম লড়াই আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। বিশেষ এই শব্দালঙ্কার- বক্রোক্তিকে নিছক একটা শব্দালঙ্কারের মালিন্য থেকে মুক্ত করে আকাশ-জোড়া প্রসারতা দিয়েছিলেন কুন্তক তাঁর 'বক্রোক্তি জীবিতম্' গ্রন্থে। কিন্তু তারও আগে তাঁকে সুনিপুণ যুক্তির জাল বুনতে হয়েছিল জনপ্রিয় অলঙ্কারবাদ ও রীতিবাদের বিরুদ্ধে। অন্য দিকে রসবাদ এবং ধ্বনিবাদের সঙ্গে কুন্তকের রসায়ন অস্পষ্ট। তবে কাব্যের আত্মা হিসেবে বক্রোক্তিকে নির্বাচন ও কাব্য-শরীরের শিরা-ধমনী জুড়ে তার স্পন্দন অনুভব আচার্য কুন্তককে দিয়েছে অনন্য এক উচ্চতা।*

**মুখ্য শব্দগুচ্ছ**: *১. কুন্তক, ২. বক্রোক্তি, ৩. অলংকার, ৪. রীতিবাদ, ৫. ধ্বনি, ৬. রস, ৭. ব্যক্তিক রচনাশৈলী, ৮. বক্রতা।*

কাশ্মীরীয় পণ্ডিত আচার্য কুন্তকের জীবৎকাল নির্ণয় করা যথেষ্ট কঠিন কাজ, তবে বলা যায় তিনি আনন্দবর্ধনের পরবর্তী এবং অভিনব গুপ্তের পূর্ববর্তী বা প্রায় সমসাময়িক। আমরা অনুমান করি- আনন্দ বর্ধন নবম এবং অভিনব গুপ্ত মধ্য-দশম থেকে মধ্য-একাদশ শতকের মানুষ। বিশ শতকের প্রথম দু-দশক পর্যন্ত কুন্তক ও তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ছিল পরোক্ষ এবং ঘোলাটে। কুন্তককে প্রথম আলোর বৃত্তে আনেন Pandurang Vaman Kane (১৮৮০-১৯৭২), আবিষ্কৃত কিছু নথির মাধ্যমে। ১৯২০ শালে তিনি উপস্থিত করেন আর এক কাশ্মীরীয় ধ্বনিতাত্ত্বিক ও সাহিত্যতত্ত্ববিদ মহিম ভট্টের 'ব্যক্তি বিবেক' গ্রন্থটি, যেখানে 'বক্রোক্তি

Society Language and Culture

জীবিতম্' ও কুন্তকের উল্লেখ ছিল। মহিম ভট্ট কুন্তকের সমসাময়িক, সম্ভবত ১০৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

মহিম ভট্ট তাঁর গ্রন্থে বক্রোক্তির কথা বলেছেন এবং কিছু আলোচনাও করেছেন। তিনি বক্রোক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, প্রসিদ্ধ পথকে পরিত্যাগ করার ফলে অন্যথা জনিত যে বৈচিত্র সৃষ্টি হয় তাই বক্রোক্তি। পুনশ্চ তাঁর সংযোজন,-- শাস্ত্রাদিতে শব্দ ও অর্থের যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত তার ব্যতিক্রম প্রসূত যে বৈচিত্র-লক্ষণ সেই বৈচিত্রই বক্রোক্তি, সেই বক্রোক্তিইকাব্যে জীবিত, এবং তাই কাব্যের আত্মা। মনে হয় যেন কুন্তকের বক্রোক্তিবাদের হৃদয়-স্পন্দন ছুঁয়ে দেখছেন মহিম ভট্ট বিলাসী আলস্যে!

সাধারণভাবে বক্রোক্তিকে আমরা চিনি একটি শব্দালংকার হিসেবে। অর্থের দ্বি-মাত্রিকতা থাকার জন্য বক্তার বলা কথা শ্রোতা বোঝে অন্য অর্থে, একে বলে শ্লেষ বক্রোক্তি। আর এক ধরণের বক্রোক্তি আছে যেখানে বক্তার স্বরভঙ্গির কারণে বিভ্রান্ত হয় শ্রোতা, একে বলে কাকু বক্রোক্তি। অর্থগত এই সঙ্কীর্ণতার বাঁধন প্রথম আলগা করার চেষ্টা করেন আচার্য ভামহ, তিনি ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের আলংকারিক। আরো কয়েক শতক পরে বক্রোক্তিকে সম্পূর্ণতা ও সুডৌল গঠন দান করেন আচার্য কুন্তক। তিনি বক্রোক্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছেন বলা চলে। তাই হয়তো মুদ্রার এ-পিঠ আর ও-পিঠ হিসেবে কালের দরবারে চিহ্নিত হবেন কুন্তক আর তাঁর নবাবিষ্কৃত বক্রোক্তিবাদ!

মাদ্রাজের সরকারী পুঁথিশালায় 'বক্রোক্তি জীবিতম্'-এর পুঁথির প্রথম খোঁজ পান পি. বি. কানে এবং সুশিলকুমার দে ১৯২০-এর কাছাকাছি সময়ে। কথিত আছে 'বক্রোক্তি জীবিতম্' বিন্যস্ত ছিল পাঁচটি উন্মেষ (অধ্যায়)-এ। সুশীলকুমার শুধু পেয়েছিলেন প্রথম তিনটি ও চতুর্থ উন্মেষের খণ্ডাংশ। ১৯২২ শালে ঐ প্রাপ্ত পুঁথির প্রত্যয়িত নকল অবলম্বনে এর ইংরাজি অনুবাদ করেন সুশীলকুমার, যা প্রকাশিত হয় ১৯২৩-এ। এর মধ্যে মালাবারের এক অধ্যাপকের সংগৃহীত 'বক্রোক্তি জীবিতম্'-এর পুঁথির গুজব নির্ভর অস্তিত্বের কথা জানা যায়, অনেক চেষ্টা করেও এই পুঁথির নকল জোগাড়ে ব্যর্থ হন সুশীলকুমার।

জয়সলমীরের জৈন মন্দিরে আর একটি পুঁথির খোঁজ পাওয়া যায়। এই পুঁথির অনুলিপি সংগ্রহে সমর্থ হন সুশীলকুমার। তারই ওপর ভিত্তি করে পাঠ সংশোধনসহ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন তিনি ১৯২৮-এ। বলা দরকার জৈন মন্দিরের পুঁথিটিও ছিল খণ্ডিত, তাতে পঞ্চম উন্মেষ ছিল না। অনেকে অবশ্য মনে করেন

Society Language and Culture

'বক্রোক্তি জীবিতম্'গ্রন্থে ছিল চারটি উন্মেষ। যাই হোক, এর পরে ১৯৮৬ সালে অধ্যাপক রবিশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় 'বক্রোক্তি জীবিতম্'-এর প্রথম তিনটি উন্মেষ বাংলায় অনুবাদ করেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে সুশীলকুমার যতটা সংশয়হীন ছিলেন রবিশঙ্কর ততটা ছিলেন না! কারিকাকারদের মূলানুগত্য ও বুৎপত্তি সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন তিনি। এমন কি কুন্তকের অপ্রচলিত হওয়ার কারণ হিসেবে কারিকাকারদের দুর্বলতাকেই দায়ী করতে চান রবিশঙ্কর!

কুন্তকের উল্লেখ ছিল রুদ্রটের 'অলংকার সর্বস্ব' ও বিশ্বনাথের 'সাহিত্য দর্পণ' গ্রন্থে। রাজশেখর ও ধনঞ্জয় ছিলেন কুন্তকেরই সমসাময়িক। 'বক্রোক্তি জীবিতম্' নামকরণের মাধ্যমে কুন্তক যেন বলতে চাইলেন,-- বক্রোক্তি এখনও বারুদ-শূন্য হয়নি, সে এখনও সজীব ও জীবন্ত। একাদশ শতকে এসে যখন ধ্বনি ও রস সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে প্রায় ধ্রুবকের পর্যায়ে তখন কুন্তক শুরু করেন নতুন আঙ্গিকে এই 'খেলা ভাঙ্গার খেলা'। এখানে একটা কথা বলার-- সংস্কৃত গ্রন্থের নামকরণের সময় গ্রন্থকার অনেক ক্ষেত্রে ছেঁকে নেন বক্তব্য আর পারম্পর্যের নির্যাসটুকু! যেমন আনন্দবর্ধন বা অনামা কোনো লেখক লিখলেন 'ধ্বনি কারিকা'। কিন্তু সংক্ষেপে ও সূত্রাকারে বলা কথার ওপর বিশ্লেষণের আলো ছড়ানো দরকার-- তাই আনন্দ বর্ধন লিখলেন 'ধ্বন্যালোক'। কিন্তু সেই আলো দেখবে কে? অভিনব গুপ্ত আনলেন আলোক-সংবেদী ইন্দ্রিয়, তিনি লিখলেন 'ধ্বন্যালোক লোচন'।

কুন্তককে অলংকার প্রস্থানের সম্প্রসারিত উত্তরাধিকার বলে মনে করেন কানে। আবার সুশীলকুমার মনে করেন, বড় বিলম্বে এসেছেন কুন্তক, তিনি যেন ভামহের হেরে যাওয়া মামলা নতুন করে লড়তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বোঝা যাচ্ছে, এই দুই সমালোচকই কুন্তককে বেশি গুরুত্ব দিতে নারাজ। এই মতের কারণও আছে- ভামহ বলেছিলেন, "সৈষা সর্বৈব বক্রোক্তি", কুন্তকও বক্রোক্তিকে কাব্যের কেন্দ্রে রাখছেন। অন্যদিকে উভয়ই রীতিবাদকে অস্বীকার করছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল এত মিল থাকলেও অমিলও কি নেই?

ভামহ বক্রোক্তিকে কাব্যের আত্মা বলেননি, যা বলেছেন কুন্তক। ভামহ 'সর্বস্ব' বলতে কাব্য-শরীরকে বুঝিয়েছেন। উভয় রীতিকে অস্বিকার করলেও কুন্তক ব্যক্তিক রীতি বা শৈলী (Style)-কে স্বীকার করেছেন। এখানেই কুন্তকের অভিনবত্ব। তা ছাড়া, লৌকিক জগতের বক্র উক্তির সঙ্গে কাব্যের বক্রোক্তির পার্থক্য গড়েন কুন্তক, কবি-প্রতিভার বৈচিত্রের বিভাজনরেখা দিয়ে।

Society Language and Culture

কুন্তকের রচনায় ধ্বনিবাদের কথা আছে এবং রসবাদের আভাস আছে। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার কুন্তক ও অভিনব গুপ্ত কোথাও পরস্পরের নাম উল্লেখ করেননি! এর কারণ কি কাশ্মীরের প্রাকৃতিক বন্ধুরতা, নাকি নিজেদের প্রস্থানগত অহম্? আমরা জানি না! কৌতূহলের বিষয়-- দুজনেই তাঁরা কাশ্মীরীয়, সমসাময়িক এবং প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনে বিশ্বাসী। তবে এই মৌনতা কেন? আমরা কি ধরে নেব, এই ব্যাপারটি 'হিরন্ময় নীরবতা?' শব্দের প্রতীয়মান অর্থ (ধ্বনি)-কে বক্রোক্তিরই বৈচিত্র বলে গণ্য করেন কুন্তক। পাশাপাশি রস সেই বৈচিত্রকে আরো উজ্জ্বল এবং প্রস্ফুটিত করে বলে তিনি নির্ধারণ করেন।

প্রথমে কুন্তক জোরালো আঘাত হানেন অলংকার প্রস্থানে। তিনি বলেন, অসংখ্য শব্দ ও অর্থালংকার আসলে বক্রোক্তিরই প্রকারভেদ ছাড়া আর কিছু নয়। আচার্য দণ্ডীর অলংকারকে বক্রোক্তি ও স্বভাবোক্তিতে বিভাজন তিনি মেনে নিতে পারেননি। এর কারণ স্বভাবোক্তি তো আসলে বস্তুকে তার যথাযথ রূপে কাব্যে উপস্থাপন। আর বৃহত্তর অর্থে কাব্য তো এই যাথার্থেরই অনুসারী! আরো স্পষ্ট করলে বলা চলে- সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে স্বভাবেরই অনুকারিতা! তাহলে কাব্যটাই তো স্বভাবোক্তি! সে ক্ষেত্রে অলংকার হিসেবে স্বভাবোক্তির পৃথক অস্তিত্ব কোথায়? কুন্তক ঘটনাটিকে নিজের কাঁধে নিজেই চড়ার মতো অবাস্তবতা বলে মনে করেন।

বামনাচার্যের রীতিবাদকে অস্বীকার করেন কুন্তক। অঞ্চলভেদে এই রীতিভেদ হাস্যকর তাঁর কাছে! এর কারণ বৈদর্ভী, গৌড়ী বা পাঞ্চালী রীতি অঞ্চল সাপেক্ষ। অর্থাৎ, ঐ বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীরা বিশেষ বিশেষ ঐ রীতিগুলোতেই কাব্য রচনা করলেই সাফল্য পাবেন! দণ্ডি আবার বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতি মেনে নিয়েও সেগুলোকে বামণাচার্যের মত উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদরেখায় বিভাজন করলেন। পরে রুদ্রট লটীয় নামে একটি রীতি আমদানি করেন। এর পর যুক্ত হয় ভোজদেব আনীত মাগধী ও অবন্তী বা অবন্তিকা নামে অন্য দুটি রীতি। আচার্য রাজশেখরও পিছিয়ে ছিলেন না, তিনি আনলেন মৈথিলী রীতি। এইভাবে নিরবচ্ছিন্ন স্রোতে বাড়তেই থাকবে রীতির সংখ্যা! তা ছাড়া, মধ্যম বা অধম জেনেও গৌড়ী বা পাঞ্চালীতে কেন কেউ কাব্য রচনা করবে বৈদর্ভী রীতিকে পরিহার করে? এই প্রেক্ষিতে রীতি তো হওয়া উচিত একটাই! রীতিবাদ মেনে নিলেও প্রশ্ন থাকে-- বিদর্ভ অঞ্চলের কবি বা সাহিত্যিকেরা সকলে কি কালিদাস বা ভবভূতির উচ্চতায় নিজেদের নিয়ে যেতে পারবেন?

আঞ্চলিক এই রীতিভেদ না মানলেও কুন্তক ব্যক্তিক রীতি বা শৈলীকে মান্যতা দিয়েছেন। তাঁর মতে ব্যক্তিভেদে রীতি হতে পারে অসংখ্য। কাজেই সংখ্যায় এই রীতিকে বাঁধার প্রয়াস নিছকই পণ্ডশ্রম! কবি-প্রতিভার বৈচীত্র খুলে দেবে নতুন নতুন রীতির আলোকিত জানালা, এখানেই কুন্তক অতিমাত্রায় আধুনিক। ব্যক্তিক রীতিকে

Society Language and Culture

প্রাধান্য দিয়ে তিনি দেখালেন নিজস্বতা। 'Lyrical Ballads'-এর ভূমিকায় Wordsworth যে বলেছিলেন, "Style is The Man himself" কয়েক শতক উজানে প্রাচ্যের এক তাত্ত্বিকের গলায় শুনলাম যেন ঐ একই কথার অতীত-প্রতিধ্বনি!

ভামহের অনুবর্তী কুন্তক, কিন্তু মতাদর্শে অনেক সময় উভয়ের বৈপরীত্য চোখে পড়ে। ভামহ বলেছিলেন, "শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যং", অর্থাৎ, শব্দ ও অর্থের সুষম সমবায়ই কাব্য। তাহলে তো শিশুর দেয়ালা আর অসংলগ্ন প্রলাপ ছাড়া আর সব ক্ষেত্রেই শব্দ ও অর্থের সহিতত্ব স্থাপিত হয়, সেগুলো সবই কি কাব্য? যদি বলা হয়, "জল এনে, ভাত বেড়ে, খেতে দাও", এখানে শব্দ ও অর্থের সহিতত্ব ঠিকই আছে, কিন্তু এটা কি কাব্য?

কুন্তক বললেন, "শব্দার্থ সহিতৌ বক্র কবিব্যাপারোশালিনী। বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্বিধ আহ্লাদকারিণী।। "তিনি জানালেন, কাব্যে যে শব্দমালার সমবায়ে অর্থের উৎসার হচ্ছে তা যখন কবি-প্রতিভার বক্রতা ধর্মের ছোঁয়ায় পাঠকের কাছে আহ্লাদজনক হয়ে ওঠে তখনই বক্রতার সার্থকতা, এখানেই লৌকিক জগতের বক্রোক্তির সঙ্গে ব্যবধান রচনা করে কাব্য তথা সাহিত্যের বক্রোক্তি! এই বক্রতাকে কুন্তক বলেছেন, 'বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতি'। এটা আসলে কবি-প্রতিভা সঞ্জাত এক মোচড় যা বাচ্য-বাচকের সীমানা ছাড়িয়ে শব্দকে নিয়ে যায় বিচিত্র এক অভিধায়। এ ক্ষেত্রে আভিধানিক অর্থ পরিত্যাগ করে শব্দ পায় অন্যতর এক মাত্রা।

বোঝাই যাচ্ছে এই বক্রতায় এক দিকে থাকছে কবির প্রতিভা আর অন্য দিকে পাঠকের আহ্লাদ। এই দুয়ের সংযোগ-সেতু হিসেবে কাজ করছে কাব্য। ফলে ভেসে উঠছে ত্রিকোণ একটা জ্যামিতি: কবি, কাব্য ও পাঠক। কোনো বিশেষ বক্রতা থেকে আনন্দ পায় না পাঠক, সে তা পায় সমগ্র কাব্যটি থেকে। বামন ও দণ্ডী জোর দিতে চেয়েছিলেন শব্দ ও অর্থের বক্রতার ওপর। রীতিবাদী হয়ে বিমূর্ত ধারণার চেয়ে দৃশ্যমান বিষয়ের প্রতি তাঁদের ঝোঁক থাকাটাই স্বাভাবিক। উপমার আশ্রয় নিয়ে সে ক্ষেত্রে কুন্তকের বক্তব্য,-- কোন তিলের বীজ থেকে কোন তৈলবিন্দুটির জন্ম হয়েছে তা যেমন বলা সম্ভব নয়, তেমনই বলা যাবে না শব্দের বা অর্থের বিশেষ কোন্ বক্রতা থেকে পাঠক কোন্ আহ্লাদের কণাটা আহরণ করলেন। তাই শব্দ ও অর্থ মিলে যে সামগ্রিক বক্রতা নির্মাণ করে একটা রচনায়, সেই সম্পূর্ণতার আস্বাদনই বাস্তবোচিত।

লৌকিক জগতের বাচ্য-বাচকের সম্পর্ক যেমন বাঁধা আভিধানিক নির্দিষ্টতায় তেমনই কাব্যের শব্দসমূহও অপরিবর্তনীয়। অর্থাৎ কুন্তকের মতে কাব্যে ব্যবহারের পর কোনো শব্দকে তার প্রতিশব্দ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা

Society Language and Culture

যাবে না। আচার্য দণ্ডীও ঐ একই কথা বলেছিলেন পূর্বে, কিন্তু শব্দের বক্রতা ধর্মের কথা তিনি বলেননি। শব্দের এই অপ্রতিস্থাপনীয় হওয়ার কারণ একটি শব্দ কাব্যে যে বক্রতা তৈরি করে তা সৃজনের ক্ষমতা অন্য সমার্থক শব্দের নেই। যান্ত্রিকভাবে কাজটা করলে আঘাত লাগবে কাব্য-শরীর জুড়ে। কালিদাস তাঁর 'মেঘদূত' কাব্যে অনেকবার মেঘের প্রতিশব্দ হিসেবে "অম্বুধর" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অনেক সমার্থক শব্দ থাকা সত্যেও কেন এই ঝোঁক? আসলে অম্বুধর শুধু জলই ধারণ করবে না বিরহী যক্ষের বার্তা ধারণ করে নিয়ে যাবে যক্ষপ্রিয়ার কাছে। পাশাপাশি অম্বুধর তার স্নিগ্ধ সজলতায় তরলায়িত করবে যক্ষের বিরহ আর অশ্রু। এতটা স্থিতিস্থাপকতা অন্য প্রতিশব্দের আছে কি? আনন্দবর্ধন বলবেন এটা ধ্বনি আর কুন্তকের মতে এটা বক্রোক্তি!

কবিভেদে রীতি হতে পারে অসংখ্য বলেও কুন্তক কবি ব্যাপার (কবি-প্রতিভা)-র নিরিখে বক্রোক্তিকে বিভাজিত করলেন ছয়টি বিভাগে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'বিস্ময়, প্রেম ও কল্পনা'-র মিশ্রণ-দক্ষতার নিক্তি ওজনে! এই বিভাগগুলি হল- বর্ণবিন্যাস বক্রতা (Phonetic Figurativeness), পদপূর্বার্ধ বক্রতা (Lexical Figurativeness), পদপরার্ধ বক্রতা (Grammatical Figurativeness), বাক্যবক্রতা (Sentential Figurativeness), প্রকরণ বক্রতা (Contextual Figurativeness) ও প্রবন্ধ বক্রতা (Compositional Figurativeness)। এগুলি আবার বিভক্ত অসংখ্য উপবিভাগে।

বর্ণসংস্থানের ব্যবস্থাপনাই 'বর্ণবিন্যাস বক্রতা'। শব্দের মত কাব্যে বর্ণ-সজ্জাও অপরিবর্তনীয়। মূলত, যমক ও অনুপ্রাসের ব্যবহার হয় এই বক্রতায়। উদাহরণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের খুব চেনা দুটো পংক্তি উদ্ধৃত করি- - "গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।/ কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।" এখানে 'গগনে' ও 'গরজে' শব্দে গম্ভীর গ-ধ্বনির সুপ্রযুক্ত অনুপ্রাস আছে। বর্ষা-দিনের ছায়া-ঘন বাতাবরণ এবং দূরাগত মেঘের মন্দ্রটুকু যেন আল্লা দানায় মাখানো আছে ঐ গ-ধ্বনির অনুপ্রাসে। গগনের জায়গায় বিমান, অম্বর, নীলিমা বা আকাশ শব্দের বর্ণসজ্জার সেই গভীরতা নেই, অন্তত 'সোনার তরী' কবিতায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে।

অদ্ভুত একটা বিষয় এখানে উঠে আসছে : সংখ্যাহীন শব্দ ও অর্থালংকারকে বক্রোক্তির বৈচিত্র হিসেবে ধরেছিলেন কুন্তক, অথচ বর্ণবিন্যাস বক্রতায় বর্ণসজ্জার ক্ষেত্রে তিনি নির্দেশ করলেন যমক ও অনুপ্রাসের দিকে, যেগুলি আদতে এক-একটা শব্দালংকার ছাড়া আর কিছু নয়! তবে তো মানতেই হবে সময়-বিশেষে বক্রোক্তি নিজের বিস্তৃত পরিসর ছেড়ে শব্দালংকারের সঙ্কীর্ণ সীমা মেনে নেয়!

Society Language and Culture

পদপূর্বার্ধ বক্রতা মূলত উপসর্গ, বিশেষ্য ও বিশেষণীয় বক্রতা। যেমন 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের চেনা দুই পংক্তি, "পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,/ আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।" এখানে বিশেষ্য 'গ্রন্থি'-কে বিশেষিত করছে বিশেষণ 'বন্ধনহীন'। লৌকিক দৃষ্টিকোণে গ্রন্থি হয় বাঁধন যুক্ত, কিন্তু কবি-কল্পনায় তা হয়েছে বাঁধনহীন!

পদপরার্ধ বক্রতায় প্রত্যয় ও বিভক্তিতে বক্রতা তৈরি হয়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'আমরা' কবিতার এক জায়গায় লিখছেন, "দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশ প্রদীপ জ্বালি,/ আমাদেরই এই কুটিরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি;" এখানে ঠাকুর শব্দের সঙ্গে 'আলি' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'ঠাকুরালি' শব্দটি গঠিত হয়েছে, যার অভিপ্রেত অর্থ দেবমহিমা বা দেবতার লীলা। অন্য দিকে 'ঠাকুর' শব্দের অভিধানগত অর্থ কিন্তু দেবতা।

বাক্য বক্রতায় গোটা বাক্যটাই হয় বক্র। আর একটা উদ্দেশ্য অবশ্যই স্রষ্টার সৃজনে নিহিত থাকে, তা হল সৌন্দর্য বিধান। 'সহজ পাঠ'-এর প্রথম ভাগে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলছেন, "ফিরিব বাতাস বেয়ে রামধনু খুঁজি/ আলোর অশোক ফুল চুলে দেব গুঁজি।" এই ঘটনা শিশুর সুগন্ধী স্বপ্নে সম্ভব কিন্তু বাস্তবে তা অতিকল্পনা। তাই বাক্যটিতে এসেছে বক্রতা। কিম্বা ধরুন, রবীন্দ্রনাথেরই 'জীবিত ও মৃত' গল্পের শেষ পংতি, যেখানে বক্রতার শৈল্পিক ছুরি বুলিয়েছেন স্রষ্টা, "কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই।"

প্রবন্ধ বক্রতা প্রধানত আখ্যানের বক্রতা। সাহিত্যিকের মায়াবী স্পর্শ যেখানে কাহিনীর সমান্তরাল বুননে সংশ্লেষ করে সমধর্মী আস্বাদ্যমানতা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসে আমরা দেখি রাজসিংহ, ঔরঙ্গজেব ও চঞ্চল কুমারীর ঐতিহাসিক কাহিনীর সমান্তরালে চড়া রঙে আঁকা হয়েছে ঔরঙ্গজেব ও নির্মল কুমারীর আখ্যান। দ্বিতীয় কাহিনীটি অনৈতিহাসিক হয়েও লেখকের বয়ন কৌশলে হয়েছে ইতিহাসগন্ধি। আর রোমান্টিকতার স্বপ্ন-উড়ান মনে হয় উভয় ক্ষেত্রেই সমানুপাতিক।

প্রকরণ বক্রতা গড়ে ওঠে কোনো সংরূপের বা প্লটের নির্মাণশৈলীর ওপর ভিত্তি করে। এ ক্ষেত্রে স্রষ্টা নিজের বিশেষ কোনো ভাবনাকে অভিব্যক্ত করেন রচনাটির গঠনগত বক্রতায়। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে রবীন্দ্রনাথের নারী বিষয়ক ভাবনার প্রতিফলন হয়েছে গল্পটির গঠনশৈলীর মুন্সিয়ানায়। এটা আমরা প্রকরণ বক্রতা বলতে পারি।

Society Language and Culture

অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষের মতে, এই ছয় বিভাগ ও তার অসংখ্য উপবিভাগের সবগুলিই বাংলা সাহিত্যে সুপ্রযুক্ত হবে না, বা প্রয়োগ করা যাবে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়-- পদপূর্বার্ধ বক্রতার একটি উপবিভাগ হল লিঙ্গ বক্রতা। অন্যান্য লিঙ্গ হওয়া সত্যেও যেখানে নমনীয়তা আনার জন্য স্ত্রী বাচক বিশেষণ ব্যবহার করা হয়। গ্রীক ভাস্কর্যের মত সুন্দর একটি ছেলে সম্বন্ধে যদি বলা হয় 'একটি সুন্দরী ছেলে' তাহলে সেটা কী গ্রহণযোগ্য হবে কোনো পক্ষের কাছে?

আঞ্চলিক রীতিভেদ অস্বীকার করেও কবি-প্রতিভার ভিত্তিতে কুন্তক তিনটি মার্গ বা পন্থার কথা বলেন। এগুলি হল-- সুকুমার, বিচিত্র ও মধ্যম বা উভয়াত্মক। কবিভেদে রীতি হতে পারে অসংখ্য যিনি বলেছিলেন, সেই তিনিই বললেন তিনটি মার্গের কথা! শুধু তাই নয়, কুন্তক বেঁধে দিলেন- মার্গ নির্দিষ্ট করেই তিনটে হবে, দুটি বা চারটি নয়। মুক্তমনা কুন্তক যে রীতিবাদ থেকে সরল-রৈখিক পথে যাত্রা সুরু করেন সোনালী সমাপ্তির পথে, সেই তিনিই আবার পথ ও মতের বৃত্তচাপ রচনা করে ফিরে এলেন রীতিবাদের সঙ্কীর্ণতায়! একে আমরা সংজ্ঞা নির্ণয়ে মৌলবাদ ছাড়া কীই বা বলতে পারি?

ওজঃ, প্রসাদ, মাধুর্য, কান্তি ইত্যাদি গুণের সমণ্বয় ও বিন্যাসে এই মার্গগুলি গঠিত, অনেকটা বামনাচার্যের তিন রীতির মত। এই গুণ হল সেই উপাদান যা কাব্য-শোভার সমৃদ্ধি ঘটায়। সুকুমার মার্গ সম্পর্কে কুন্তকের ব্যাখ্যা, যে পন্থায় কালিদাস প্রভৃতি কবিগণ কাব্য রচনা করেছেন তাই সুকুমার মার্গ। প্রশ্ন থেকেই যায়,-- কালিদাসের শৈলী অনুসরণ করলেই কী নিজস্বতা থাকবে কোনো কবির? পরিশেষে তা তো অক্ষম অনুকরণে পর্যবসিত হবে! সাহিত্য, চিত্রকলা বা অন্যান্য শিল্পকলায় নকলের চেয়ে আসলের কদর অনেকাংশে বেশি, এটা বুঝতে তত্ত্ববিদ না হলেও চলে। ব্যক্তিক রীতির আলোকিত সুড়ঙ্গ খুলে দিয়েও কুন্তক যে কেন আলোর পথে পথ হারালেন তা বোঝা কঠিন।

আঞ্চলিক রীতিভেদ তাও মন্দের ভাল, সেখানে স্থানীয় কিছু লিখন কৌশল বা বৈশিষ্ট্য ছাপ ফেললেও ফেলতে পারে। কিন্তু অসংখ্য কবি, সংখ্যাহীন তাদের মন। ঝাঁকবদ্ধ এই সৃজন-প্রতিভার শ্রেণীকরণ কোন যাদুকাঠির ছোঁয়ায় করবেন কুন্তক? যদি বলা হয় এই মার্গের বিভাজন অঞ্চলভেদে নয় কবির প্রতিভার ভিত্তিতে। তবুও যুক্তিটি গ্রাহ্য হবে না সমালোচকের আতস কাচের তলায়। মূলত, অঞ্চল ও গোষ্ঠীগত মোড়ক ভাঙার জন্যই ব্যক্তিক রীতির প্রবর্তনা করেছিলেন কুন্তক। তাঁর ভাবনা ছিল, কবির মানস রাজ্যের অনুভূতিগুলির নিজস্ব ও বক্রতাময় উপস্থাপনাই কাব্য, যা হবে আহ্লাদজনক। এই মার্গভেদ করে তো কুন্তক আবার গোষ্ঠীভিত্তিক এবং পরিশেষে আঞ্চলিক লিখনরীতিতেই ফিরে এলেন!

Society Language and Culture

পর্যায়ক্রমিক স্ববিরোধিতা হয়ত সময়ের থেকে এগিয়ে থাকা এই প্রজ্ঞাবান মানুষটির অপ্রচলিত হওয়ার কারণ। মনে হয় গোষ্ঠী-চেতনাই ছিল প্রাচীন ভারতীয় অলংকার প্রস্থানগুলির মৌল বৈশিষ্ট্য। কুন্তক ব্যক্তিক রীতির কথা এনে ভাঙন ধরালেন সেই অচলায়তনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই অভিকেন্দ্র বল এড়াতে পারলেন না তিনি। যদিও রবিশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের মত সমালোচক রবিরঞ্জন ঘোষও টীকাকারদের দুর্বলতাকেই দায়ী করেছেন এই অপ্রচলিত হওয়ার জন্য। পাশাপাশি তিনি প্রচ্ছন্ন ইশারা করেন অভিনব গুপ্ত ও তাঁর সম্প্রদায়ের ভূমিকার দিকে। অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষ কুন্তকের ভ্রান্তির দিকগুলি মেনে নিয়েও তাঁর মৌলিকতা ও আধুনিকতাটুকু ছেঁকে নিতে চান।

অনেক সমালোচক এই স্ববিরোধিতার অংশগুলো প্রক্ষিপ্ত বা অন্য কারো সংযোজন বলে মনে করেন। সে ক্ষেত্রে সন্দেহের কাঁটা নির্দেশ করে কারিকাকারদের দিকেই। কিন্তু নিশ্চিত প্রমাণ না পেলে এই সংশয়ে শিলমোহর দেওয়া যায় না। কাজেই অমৃতের পাশাপাশি হলাহলটুকু কুন্তককেই কণ্ঠে ধারণ করতে হবে, অন্তত যত দিন না অকাট্য কোনো পাথুরে প্রমাণ দিনের আলোয় আসছে।

তাত্ত্বিক এই ভ্রান্তি-বিলাস যেন নিঃসঙ্গ কুন্তকের সহচর : তাঁর যুক্তির তূণীরের তীক্ষ্ণতম তীর তাঁরই রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে বার বার। তবে আধুনিক সাহিত্যিকের কাছে ধ্বনিবাদ এবং রসবাদের চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয় বক্রোক্তিবাদ। তাই হয়ত দেখি, শঙ্খ ঘোষ মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লেখেন 'কুন্তক' নামের আড়ালে! আসলে আধুনিক জীবন-জটিলতা এবং সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো রসবাদ বা ধ্বনিবাদ দিয়ে ব্যক্ত করা কঠিন। সে ক্ষেত্রে রূপোলি রেখা হতে পারে কুন্তক ও তাঁর বক্রোক্তিবাদ।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য তথা পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সমালোচনায় রসবাদ অপ্রচলিত, অন্য দিকে ধ্বনিবাদের ব্যবহার আংশিক। জটিল এই পরিস্থিতিতে বক্রোক্তি দেখাতে পারে পথের দিশা। মতটা কালাপাহাড়ী মনে হওয়াই স্বাভাবিক, তা হলে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক-- ধরা যাক, একটা রচনা, তা যে কোনো সংরূপই হতে পারে। যার মূল বিষয় বা ভাবটি এমন, একটা মানুষ, যে জীবনের প্রতি তিতিবিরক্ত! সে চাইছে অসহ্য এই জীবনটাকে বমির মত নিঃশেষে উগরে দিতে। এখন যদি এই ভাবের সঙ্গে উপযুক্ত বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের সংযুক্তি দ্বারা পরিপুষ্টি সাধন করা হয় তাহলে তা কোন স্থায়ীভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কোন রসের উৎসার ঘটাবে? মনে রাখতে হবে, সঞ্চারী ভাবের কোনো রসমূর্তি নেই। বড় জোর তা ভাবধ্বনির সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু ধ্বনিবাদের মোক্ষ তো রসধ্বনিতে!

Society Language and Culture

অধ্যাপক পি. বি. কানে কুন্তককে যতই অলংকার প্রস্থানের পরগাছা বা লেজুড় ভাবুন না কেন, সময়ের গ্রহণ-বর্জন শেষে তিনিই পেয়েছেন সাফল্যের ছোঁয়া। ভামহের মতের সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক মিল থাকলেও তাঁকে অতিক্রম করেছেন কুন্তক। আবার বিরোধিতা, প্রস্থানগত উষ্মা, আত্মবিরোধ সত্ত্বেও তিনি হারিয়ে যাননি কালের চোরা ঘূর্ণিতে। তাঁর স্বচ্ছ ভাবনা, নিরপেক্ষ বিচারশক্তি ও আধুনিকতা তাঁকে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্যের স্নিগ্ধ দ্যুতি। তাঁর বিশ্বাসের প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনের ভাষা একটু সাজিয়ে নিয়ে বলা যায়,-- কুন্তক ও তাঁর বক্রোক্তিবাদ সময়ের ধারাস্নানে মলাবরণ মুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে স্বচ্ছ দর্পণ-স্বভাব হয়ে উঠছে আধুনিক মানসে।

**আকর গ্রন্থ:**

১.'অলংকারচন্দ্রিকা' শ্যামাপদ চক্রবর্তী, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েড পাবলিসিং কোং প্রাঃ লিঃ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ভাদ্র ১৩৬৩

২.'প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের ভূমিকা' শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ৩৮ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা -৬

**সহায়ক গ্রন্থ:**

১। 'রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ' তপোব্রত ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ ২২শে শ্রাবণ ১৪১০, আগস্ট ২০০৩

২। 'রবীন্দ্রনাথের কাদম্বরী চর্চা' তপোব্রত ঘোষ, পরম্পরা প্রকাশন, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৮।

৩। 'উর্দূ কাব্যের ভুবন', তৌহিদ হোসেন, করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১০

Society Language and Culture